গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা | ১২ - ১৮ জুলাই ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আজকের যুগের সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ তুলে ধরা হল।

"... মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব, যা আজকের যুগে সবচেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বা ভাবাদর্শ এবং যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটা নতুন শোষণহীন শ্রেণিহীন উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে সক্ষম। এবং এ কথাও আমরা জানি যে, বিপ্লবী ভাবাদর্শ ও মতবাদ এবং বিপ্লবী তত্ত্ব সব সময়েই উন্নততর সংস্কৃতিগত ও নৈতিক মানের জন্ম দিয়ে থাকে। এই উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান অন্তত খানিকটা অর্জন করতে না পারলে একটা দেশের জনসাধারণ কখনওই বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে না। তা হলে, এই সমস্ত পার্টিগুলি, যারা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের জাহির করছে, যদি যথার্থই তারা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হত, তা হলে এদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে অন্ততঃপক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের এবং ছাত্র

সাতের পাতায় দেখুন

গণপ্রহার রুখতে সরকার কি আন্তরিক — তিনের পাতায়

সস্তা তেলে মুনাফা — সাতের পাতায়

হাথরস বিপর্যয় ঃ সামনে এল 'আইনশৃঙ্খলায় স্বর্গরাজ্যে'র আসল চেহারা

"আমরা গরিব মানুষ, পড়াশোনা জানি না। গ্রামের লোকেরা কেউ দিনমজুরি, কেউ রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, কেউ বা রং মিস্ত্রির কাজ করে। এখানে পুরুষরা কষ্ট ভুলতে মদের নেশায় ডুব দেয়, আর মহিলারা একটু শান্তির খোঁজে এই সব ধর্মীয় সমাবেশে যায়"— বলছিলেন অঞ্জলি দেবী, যাঁর দুই পড়শি আশা দেবী ও মুন্নি দেবী ২ জুলাই হাথরসে 'ভোলে বাবা'র ধর্মীয় সমাবেশে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন। এ দিনের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় আবার খবরে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশের হাথরস। সেখানকার ফুলেরিয়া গ্রামে ২ জুলাই স্বঘোষিত ধর্মগুরু সুরজ পাল ওরফে ভোলে বাবা ওরফে নারায়ণ সাকার হরির ধর্মসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের, যাঁদের বেশিরভাগই মহিলা। আহতদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। এর আগে ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এই হাথরসেই উচ্চবর্ণের দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধর্ষিতা এক দলিত-কন্যার মৃতদেহ পরিজনদের না জানিয়েই পুড়িয়ে দিয়েছিল শাসক বিজেপির আজ্ঞাবাহী পুলিশ, যা নিয়ে দেশ জুড়ে ব্যাপক শোরগোল হয়েছিল।

জানা গেছে হাথরসে সেদিনের সমাবেশে হাজির

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেরালায় সিপিএম সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ জুলাই তিরুবনন্তপুরমে গার্লস কলেজে মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এই কোর্স উদ্বোধন করতে গেলে এআইডিএসও তীব্র বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আর অপর্ণা সহ কর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ

দণ্ডসংহিতা আইন চালু করে ভারতকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি সরকার

১ জুলাই থেকে ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় শুরু হয়েছে নতুন তিন আইনের শাসন। ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসির বদলে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা (বিএনএস), ফৌজদারি কার্যবিধি বা সিআরপিসির বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ও এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ)। গত বছর ১১ আগস্ট সংসদে বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে আইনমন্ত্রীর বদলে প্রথা বহির্ভূতভাবে বিল পেশ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত ডিসেম্বরে ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে, প্রায় বিরোধীশূন্য সংসদে পাশ করানো হয়েছিল তিনটি বিল, যা ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর আইন হয়ে যায়। বিস্তারিত মতামত গ্রহণ, আলোচনা-পর্যালোচনার তোয়াক্কা না করেই অত্যন্ত দ্রুততায় বিল তৈরি থেকে আইন পাশ করিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আইনের একটি সংশোধনেই যেখানে পর্যাপ্ত তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন থাকে, সেখানে দেশের আইনের সম্পূর্ণ কাঠামোটির বদল ঘটাতে জনসাধারণ এবং আইনবিদ সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার চেষ্টাই করল না কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার অবশ্য পরামর্শদাতা হিসাবে বিজেপি এবং আরএসএস-এর সদস্য বা ঘনিষ্ঠ কিছুজনের নাম তুলে ধরছে। ফলে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া এই তিনটি আইন কোনও ভাবেই গণতান্ত্রিক আইন কাঠামো দিতে পারে কিনা প্রশ্ন উঠছে।

একটা পরাধীন দেশের আইন আর একটা স্বাধীন দেশের আইন এক

তিনের পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটারের তীব্র বিরোধিতা

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইকা) -এর সভাপতি স্বপন ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল ভাট ৪ জুলাই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরকে এক স্মারকলিপি পাঠিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণ এবং স্মার্ট মিটার বসানোর তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

স্মারকলিপিতে তাঁরা বলেছেন, ডঃ বি আর আম্বেদকর ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) অ্যাক্ট ১৯৪৮-এ বলা হয়েছিল, (১) সমস্ত স্তরের গ্রাহকদের সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে,

আটের পাতায় দেখুন

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

সমাবেশ

SUCI (C)

বক্তা - কমরেড প্রভাস ঘোষ ● সভাপতি - কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী

● রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ
● বেলা ২টা

‘আইনশৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্যে’র আসল চেহারা

একের পাতার পর

হয়েছিলেন শিশু-মহিলা সহ আড়াই লাখ মানুষ। ৮০ হাজারের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তার কয়েক গুণ বেশি মানুষ যে সেখানে জমায়েত হচ্ছে, ‘আইনশৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্যে’র প্রশাসনের নাকি তা জানা ছিল না। ফলে উপযুক্ত সংখ্যায় পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল না। সভা শেষে ধর্মগুরু সুরজ পাল মণ্ডপ থেকে বেরোতেই তাঁর পদধূলি নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভক্তরা কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে গুরুর গাড়ির দিকে দৌড়তে থাকেন। গুরুর রক্ষীরা ভিড় সামলাতে লাঠি চালালে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেকে পিছনের মাঠের দিকে যেতে চাইলে বৃষ্টির জলে ভেজা মাটিতে পিছলে পড়েন। তাঁদের শরীরের উপর দিয়েই দৌড়তে থাকেন অন্যরা। এই মারাত্মক বিশৃঙ্খলায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, প্রবল আঘাতে শরীরের ভিতরের দেহাংশ বিকল হয়ে কিংবা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ১২৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। রাজ্য জুড়ে এখন শোকের ছায়া।

প্রশ্ন হল, স্থানীয় প্রশাসন কেন জানতে পারল না যে, এই ধর্মসভায় এমন বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হচ্ছে? কেন তার জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হল না? কেন সমাবেশ শুরুর আগে প্রশাসনিক প্রধানরা সরেজমিনে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন না? বিজেপি শাসনে উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলার প্রবল উন্নতি হয়েছে বলে অবিরাম ঢাক পেটানো চলে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কঠোর নজরদারিতে সে রাজ্যে দুষ্কৃতীদের নাকি পার পাওয়ার উপায় নেই! শাসক দলের নির্দেশে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ-প্রশাসন আইনের বিচার বা অভিযুক্তের বক্তব্যের তোয়াক্কা না করেই কী ভাবে স্রেফ বুলডোজার চালিয়ে দুষ্কৃতীদের শাস্তি দিয়ে থাকে, তা-ও সকলের জানা। আইনশৃঙ্খলার এ হেন ‘স্বর্গরাজ্যে’ জনসমাবেশ সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে দেখেও পুলিশ-প্রশাসন তা আটকায়নি কেন? কেন সেদিন ঘটনাস্থলে যথেষ্ট সংখ্যায় পুলিশ পাঠানো হয়নি? এত বড় একটা সমাবেশ সত্ত্বেও কোনও মেডিকেল টিম তৈরি ছিল না কেন? জানা গেছে দুর্ঘটনার অনেক পরে প্রথম অ্যাম্বুলেন্সটি ঘটনাস্থলে আসে। তারও পরে আসে পুলিশ ও দমকলের লোকজন। কার্যত গ্রামবাসীরাই বহুক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ ও আহতদের উদ্ধারের কাজ চালান।

হাথরসের এই মর্মান্তিক ঘটনা যে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতার এক জ্বলন্ত নজির এ কথা মানতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও তাঁর দোসররা। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এর পিছনে ষড়যন্ত্রের সন্দেহের কথা তোলার চেষ্টা করেছেন। এলাকাবাসীদের অনেকের অভিযোগ, দুর্ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলতেই আসলে বিজেপি সরকার ষড়যন্ত্রের গল্প সাজাতে চাইছে। তাঁদের একজন বিন্ধ্যেশ্বর সিং জানান, তদন্তের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ঘটনার দিনই গোটা দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার করে ফেলার অনুমতি দেয়। পরদিন তদন্তকারী টিম ও গোয়েন্দা কুকুর যখন আসে, তার আগেই সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার পর পুলিশ যে অভিযোগ দায়ের করে, সেখানে উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের নাম থাকলেও খোদ সুরজ পাল নামটিরই কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই ভুয়ো ধর্মগুরু ও তাঁর দলবলের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বাস্তবে কোনও ভোটবাজ রাজনৈতিক দলই এইসব ধর্মগুরুদের চটাতে চায় না, বরং তোয়াজ করে চলে। কারণ এদের পিছনে যে বিপুল ভক্তসমাবেশ, তা থেকে বিজেপি, কংগ্রেস সহ সমস্ত ভোটসর্বস্ব দলেরই নির্বাচনে ফয়দা তোলার মতলব থাকে। সেই কারণেই হাথরস দুর্ঘটনায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে সুরজ পাল সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সযত্নে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। একই ভাবে, কেন সুরজ পাল এখনও গ্রেফতার হননি, কিংবা কেন তাঁর নাম পুলিশের এফআইআর-এ নেই, সাংবাদিকদের এই সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন উত্তরপ্রদেশেরই সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও। ওই একই কারণে এত বড় মাপের দুর্ঘটনা ও এতগুলি মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেও বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে এই সমাবেশের কেন্দ্রবিন্দু এই ভুয়ো ধর্মগুরুর নামেই কোনও অভিযোগ দায়ের হয় না! এতগুলি দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কুখ্যাত পুলিশ-প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি বহাল তবিয়তে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে যেতে পারেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, শাসক দল, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে দহরম-মহরম না থাকলে সুরজ পালের মতো ভুয়ো ধর্মগুরুদের এমন রমরমা হতে পারে না। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, স্বঘোষিত এই ধর্মগুরু প্রথম জীবনে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন। ১৮ বছর আগে এটাওয়াতে এক মহিলাকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। এর পর তিনি ধর্মগুরু বনে যান। নিজে দলিত জাটভ সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ায় ক্রমে এই সম্প্রদায়েরই বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর ভক্ত বনে যায়। উত্তরপ্রদেশে সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই জাটভরাই তফসিলি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে ভোটের স্বার্থে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির মতো ক্ষমতালোভী শাসক দল যে সুরজ পালকে আড়াল করার চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি?

শুধু সুরজ পাল নয়, এর আগে রামরহিম, আশারাম বাপুদের মতো ভুয়ো ধর্মগুরুদের নাম বার বার সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। ধর্ষণ, খুন সহ নানা ঘটনায় ফাঁস হয়ে গেছে, অন্ধভক্ত গরিব মানুষ, ক্ষমতাপিপাসু রাজনীতিক ও কালোবাজারের কারবারিদের জোগানো টাকায় এইসব গুরুদের অসম্ভব বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, জঘন্য লাম্পট্য ও বিপুল সম্পদের মালিকানার জোরে পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে অবাধে নানা অনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকারবঞ্চিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সহজ-সরল মানুষ একটু শান্তি, একটু আশ্বাসের খোঁজে বার বার ছুটে যায় মতলববাজ এইসব প্রতারক ‘বাবা’দের কাছে। বার বার তাদের প্রতারণার শিকার হয়। আর হাথরসের এই ঘটনায় তো জীবনই চলে গেল ১২৬ জন নিরুপায় মানুষের, যে জীবনটাকেই একটু সুসহ করার আশায় তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন ‘ভোলেবাবা’র চরণধূলি সংগ্রহ করতে! কেউ গিয়েছিলেন বেকার ছেলের চাকরির আশায়, কেউ মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে, কেউ বা মেয়ের বিয়ে বা গরিবির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হয়ে গেলেও পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের তল্পিবাহক বুর্জোয়া সরকারগুলি নিজেদের কায়েমি স্বার্থে কেউই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লাচার মানুষকে ধর্মীয় কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জাল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেনি। বরং শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে জিইয়ে রাখতে চেয়েছে সাধারণ মানুষের চেতনাহীনতাকে। বিজেপি সরকারের শাসনে ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের আরও রমরমা ঘটিয়ে সমাজকে গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রবল অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি শাসক দলগুলিরই প্রশ্রয়ে ভেকধারী ধর্মগুরুদের বাড়বাড়ন্ত হয়ে চলেছে। প্রাণ দিয়ে এরই মাশুল দিতে হল দরিদ্র, অসহায় ১২৬ জন সাধারণ মানুষকে। এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার পরে এই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি জনসাধারণ খুঁজবে না!

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র পূর্বতন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও বর্তমান বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসুদেব পুরকাইত ১৪ জুন সকালে জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে ৮২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যান্সার সহ নানা রোগে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ওই দিন জেলার সমস্ত দলীয় দফতরে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কর্মীরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। দল ও গণসংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। পরে চুপড়িঝাড়ায় তাঁর বাসভবনে ও ঘটিহারানিয়ায় লোকাল অফিসে মরদেহ আনা হয়। সেখানে মাল্যদানের পরে শেষযাত্রা হয়।

জোতদার পরিবারের সন্তান হলেও সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ৬০-এর দশকে তিনি কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর মাধ্যমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন ও দলে যোগ দেন। বেনামি ও খাস জমি উদ্ধার আন্দোলন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ রোধে, স্থানীয় নানা দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল। দীর্ঘদিন তিনি চুপড়িঝাড়ায় দলের লোকাল সম্পাদক ছিলেন। স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে ২০ বছর অঞ্চলপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। নানা উন্নয়নমূলক কাজ সাফল্যের সাথে করেছেন। স্থানীয় হাইস্কুল গড়ে তোলায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ওই স্কুলেই তিনি শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সততা, সরলতা, সর্বদাই হাসিমুখ, মহিলা-শিশু-কিশোর সহ গরিব মানুষের সাথে মধুর সম্পর্কের জন্য তিনি ছিলেন জনগণের আপনজন। দলের যে কোনও সিদ্ধান্ত তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করে তা কার্যকর করার চেষ্টা করতেন। তাঁর থেকে বয়সে ছোট যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের নেতা হিসাবে মেনে নিতে তাঁর কোনও অসুবিধা হত না। তিনি চাইতেন আত্মীয়-স্বজনরা দলের কাজে অগ্রণী হোন। দলের প্রকাশিত পত্রপত্রিকা, কমরেড শিবদাস ঘোষের বই খুঁটিয়ে পড়তেন। স্বল্পবাক এই মানুষটি শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও দলের অফিসে এসে মাসিক চাঁদা দিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হত। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন কংগ্রেসী গুণ্ডারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আততায়ীরা বসুদেব পুরকাইত ভেবে গুলি চালালে অন্য লোকের গায়ে লাগে। রাধাবল্লভপুরের এই ঘটনায় জনরোষে দু’জনের মৃত্যু হলে একদিকে প্রচারমাধ্যমে অবিরাম কুৎসা চলতে থাকে। অপরদিকে সিপিএম সরকারের পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় কংগ্রেস নেতৃত্ব ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালায়। দলের শতাধিক নেতা-কর্মীকে তারা মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে, কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরবর্তী সময়ে কায়েমি স্বার্থবাজ গোষ্ঠী ও কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা জামা বদল করে সিপিএমের আশ্রয় নেয়। রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার হঠাৎ করে ওই মামলা পুনরায় তুলে এনে কার্যত বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করে। এই সময়ে সারা রাজ্যের মতোই এই সব এলাকায় প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড আমিরালি হালদার সহ দলের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে হত্যা করে সিপিএম-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এ সব ঘটনার বেদনা বুকে চেপে রেখে, এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময়েও কমরেড বসুদেব পুরকাইত সাহসের সাথে, অনমনীয় মানসিকতায় দলকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

২৩ জুন ঘটিহারানিয়া বাজারে তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভা হয়। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী ও নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার এই সভায় বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার।

কমরেড বসুদেব পুরকাইতের মৃত্যুতে দল একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে হারাল।

কমরেড বসুদেব পুরকাইত লাল সেলাম

দণ্ডসংহিতা আইন

একের পাতার পর

হবে না, এই ভাবনাটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ ভারতের আইন ছিল ভারতবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার জন্যই, প্রতিবাদী জনসাধারণের উপর দমনপীড়ন, অত্যাচারের জন্যই। একটা স্বাধীন দেশের আইন জনস্বার্থবাহী হবে, ন্যায় বিচারের পরিপূরক হবে, নাগরিকদের এটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ফলে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন, দেশের নতুন আইন ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হবে, নতুন আইন আধুনিক ভারতের উপযোগী হবে, তখন শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু মনে রাখতে হবে একটি আইন নির্যাতনমূলক ও জনবিরোধী কি না তা আইন তৈরির সময় দিয়ে নির্ধারিত হয় না, সেই আইন জনগণের পক্ষে কল্যাণকর কিনা তা দিয়ে নির্ধারিত হয়। নতুন ফৌজদারি আইনের ধারা-উপধারা বিচার করে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই আইন ঔপনিবেশিকতার নৃশংসতাকেও অতিক্রম করে গেছে। উপনিবেশের চিহ্ন মোছার নামে পুরনো আইনের কিছু শব্দের অদল-বদল করে, ধারাগুলি আগে-পিছে করে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে একই রেখে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পরিবর্তনগুলির ছত্রে ছত্রে নাগরিক-স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্র নগ্ন হয়ে উঠেছে। নতুন আইনের কয়েকটি মাত্র ধারা পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভারতীয় ন্যায়সংহিতা

পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারা, যা দেশদ্রোহ আইন (সিডিশন) হিসেবে পরিচিত, গত বছর মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট সেই আইন প্রয়োগের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই ঔপনিবেশিক আইন বাতিলও করেছে। কিন্তু তার বদলে যা নিয়ে আসা হয়েছে, তাকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রফেসর মোহন গোপাল সঠিকভাবেই 'সিডিশন প্লাস', অর্থাৎ দেশদ্রোহ আইনেরও বাড়া বলে চিহ্নিত করেছেন। ন্যায়সংহিতার ১৫২ ধারা বলছে, কোনও কাজ, লেখা, বক্তব্য বা সংকেতের মাধ্যমে যদি 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'নাশকতামূলক কাজ', 'ভারতের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি করবে এমন কাজ' করার জন্য উত্তেজিত করা হয় বা উত্তেজিত করার চেষ্টা হয় তা হলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আইনের মোড়ক বদলেছে কিন্তু ভেতরের মাল-মশলা কিছু বদলায়নি বরং আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আইনে নেই। ফলে সরকার বিরোধী বক্তব্য, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও বক্তব্যকেই এই আইনের আওতায় ফেলা যাবে।

মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ন্যায় সংহিতার ১১৩ ধারা দানবীয় ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারার হুবহু নকল। বিশেষ আইন ইউএপিএ থাকছে, কিন্তু ইউএপিএ ধারায় মামলা করতে হলে তদন্তকারী পুলিশের বাইরে সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ পদাধিকারীদের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু ন্যায় সংহিতার এই ধারায় কার্যত ইউএপিএ-তেই মামলা হবে, পুলিশ সুপারের অনুমতি নিয়ে থানার এসআই এই মামলা করতে পারবে। এই ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে কার্যত অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে, তিনি নির্দোষ। এই ধারায় 'সন্ত্রাসবাদী কাজ'-এর সংজ্ঞা যে ভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে যে কোনও সাধারণ বক্তব্য, যা বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করবে, তাকেও অনায়াসে সন্ত্রাসবাদী কাজের আওতায় ফেলে দেওয়া যাবে। দানবীয় ইউএপিএ আইনেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা এত বিস্তৃত নয়।

ন্যায়সংহিতার ১১১ ধারায় 'সংগঠিত অপরাধ'-এর মতো বিশেষ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সাধারণ দণ্ডবিধিতে। সংগঠিত অপরাধকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যাতে প্রায় যে কোনও সরকারবিরোধী কণ্ঠস্বরকেই এই ধারার আওতায় ফেলে দেওয়া যায়। এমনকি যার বিরুদ্ধে কোনও কোর্টে একাধিক চার্জশিট জমা পড়বে, তাকেই 'ধারাবাহিক বেআইনি কাজকর্ম'-এর সঙ্গে যুক্ত বলে গণ্য করা যাবে অর্থাৎ দোষী প্রমাণ করার দরকার নেই, একাধিক অভিযোগ আনলেই হল। এর সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ন্যায়সংহিতার ১১২ ধারায় 'পেটি অর্গানাইজড ক্রাইম'-এর সংজ্ঞায় বিভিন্ন অপরাধের তালিকা দেওয়ার পর শেষ লাইনে বলা হয়েছে 'অথবা এ রকম যে কোনও অপরাধমূলক কাজকর্মকে পেটি অর্গানাইজড ক্রাইম বলা হবে'। অর্থাৎ পুলিশ ইচ্ছামতো এই লাইনটিকে ব্যবহার করতে পারে। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ বলেছিল, আইন যত অস্পষ্ট হবে, সেই আইনের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারিতা তত বাড়বে। এই আইনে পুলিশের হাতে অবাধ যথেচ্ছাচারের হাতিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে।

সারা পৃথিবীতেই প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতি হিসাবে অনশন মান্যতা পায়। ন্যায় সংহিতার ২২৬ ধারায় সরকারের নিষেধ না মেনে কোনও বিষয়ের প্রতিবাদে অনশন করলেও হতে পারে জেল। কারণ আইনে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি যে কোনও সরকারি কর্মচারীকে তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার জন্য বা তাঁকে দিয়ে কোনও কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তা হলে তার এক বছরের জেল অথবা জরিমানা অথবা দুটিই হবে। অর্থাৎ অনশনকে আত্মহত্যার চেষ্টা বলে দেখিয়ে প্রতিবাদীকে জেলে পোরা হবে।

ন্যায়সংহিতার ১৯৭(১ডি) ধারায় মিথ্যা তথ্য প্রকাশ ও পরিবেশনের শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কে বিচার করবে? সকলেই জানে, সেটা সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে। সরকারের বহুবিধ ব্যর্থতা, প্রতারণা, কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে কিছু বললেই তা হবে মিথ্যা আর তার জন্য শাস্তি হবে। সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃত নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার বলে নতুন আইনে আর কিছু থাকবে না।

ন্যায়সংহিতার ২৩ ধারায় বলা হয়েছে, জেল জরিমানার বদলে বিনা পারিশ্রমিকে 'কমিউনিটি সার্ভিস'-এর সাজা প্রচলন প্রগতিশীল পদক্ষেপ। অথচ কোনটা কমিউনিটি সার্ভিস সেটা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। পুরনো দিনের জমিদারদের খিদমত খাটার মতো সরকারের সেবা করাই হয়তো কমিউনিটি সার্ভিস বলে গণ্য হবে।

আইনের বহু ক্ষেত্রেই সাজাপ্রাপ্তের নির্জন কারাবাস বা সলিটারি কনফাইনমেন্টবাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ন্যায় সংহিতার ১১ নম্বর ধারা তার একটি। সুপ্রিম কোর্টের ১৯৭৯ সালের সুবিখ্যাত সুনীল বাত্রা মামলার রায় উপেক্ষা করেই এই বন্দোবস্ত। ব্রিটিশ আইনে যতটুকু রক্ষাকবচ ছিল, এ ক্ষেত্রে তা-ও থাকবে না।

সামগ্রিকভাবে নতুন দণ্ডবিধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সাজা ও জরিমানা বৃদ্ধি। ৩৩টি ক্ষেত্রে কারাবাসের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন মানে হয়েছে আমৃত্যু কারাবাস। ১৪ বছর কারাবাসের পর বন্দির আচার-আচরণ বিবেচনা করে রেমিশন এবং মুক্তির যে সুযোগ ছিল, এ ক্ষেত্রে তা-ও কেড়ে নেওয়া হল। সাজাপ্রাপ্তের

চারের পাতায় দেখুন

গণপ্রহার রুখতে সরকার কি আন্তরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের মধ্যে ছাত্ররা দল বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেলছে একজন মানুষকে— এই ঘটনায় শিউরে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। লোকসভা ভোট শেষ হতে না হতেই উত্তর ২৪ পরগণার একাধিক জায়গায় গণপিটুনির ঘটনা দিয়ে শুরু। পরে অন্যান্য জেলাতেও তা ছড়িয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কাউকে অপরাধী মনে হলে তাকে পিটিয়ে গায়ের ঝাল মেটানোই অপরাধ দমনের একমাত্র পথ বলে মানুষ ধরে নিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ঘটনা। সেখানে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শাসক দলের এক নেতা 'সবক' শেখানোর জন্য প্রকাশ্যে পেটাচ্ছেন দু'জনকে। শহরে গ্রামে মফসসলে শাসক দলের নেতারা বুঝে নিয়েছে তারাই আইন, তারাই প্রশাসন। পুলিশ এবং প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কোন তলানিতে গেলে এমনটা ঘটতে পারে তা সরকারের মাথারা ও পুলিশ কর্তারা ভেবেছেন কি না জানা নেই।

মুখ্যমন্ত্রী বলে চলেছেন তিনি ২০১৯-এ গণপিটুনি প্রতিরোধের আইন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের নিযুক্ত রাজ্যপাল তাতে সই না করার ফলে গণপিটুনি প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। যদিও পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধিতে খুন, মারধর ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আইন ইতিমধ্যেই আছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ এত বছর ধরে গণপিটুনিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি কেন— এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? মুখ্যমন্ত্রী এখন কড়া ব্যবস্থার বার্তা দিচ্ছেন, চোপড়ার ঘটনার পর সালিশির নামে পেটানো বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশাসন কতটা উদাসীন থাকলে বিষয়টা এতদূর গড়াতে পারে তা কি তিনি স্বীকার করবেন?

অন্যদিকে কেন্দ্রের শাসক বিজেপির দাবি, সম্প্রতি চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় গণপিটুনি রোধে কড়া আইনের সংস্থান রয়েছে। ফলে এবার এ সব বন্ধ হবে। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যেও চলতি আইনি ক্ষমতাকে হাতিয়ার করেই পুলিশ একের পর এক ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি কেন, তার উত্তর কে দেবে?

এ রাজ্যের মতোই সারা দেশে গণপিটুনির অধিকাংশ ঘটনাতেই স্থানীয় দাপুটে ক্ষমতাবানদের যোগ অবশ্যম্ভাবী। যারা নিজেরাই এলাকার আইন তথা মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে অবস্থান করেন। এ দেশে, কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে শাসকদের হয়ে কাজ করা প্রভাবশালীরা থাকেন একটা অদৃশ্য লক্ষ্মণের গণ্ডির মধ্যে। পুলিশ-প্রশাসনের সাধ্য নেই তা ভেদ করার। তাঁরাই রাখেন, তাঁরাই মারেন। সুবিধা বিতরণও তাঁরাই করেন। ফলে তাঁরা ইচ্ছা করলেই লোক জড়ো করে তাঁদের চোখে সন্দেভাজন যে কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলতেও পারেন। তাই বিজেপি রাজত্বে মহম্মদ আখলাক, জুনেইদ, পহেলু খানদের মতো মানুষকে গো-রক্ষার অজুহাতে পিটিয়ে মেরে ফেললে কোনও শাস্তি হয় না। দলিত ও সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী মানুষদের চাপে রাখতে এটাই বিজেপির অস্ত্র বলে পুলিশও বিশেষ কিছু করে না। অবশ্য পুলিশ এবং প্রশাসনও বিজেপি রাজত্বে প্রায় এই গণপিটুনির মনোভাব নিয়েই চলে। সে জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিংবা দলিত অথবা সরকারি দলের সঙ্গে না থাকা যে কোনও মানুষের ঘরবাড়ি নির্বিচারে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিয়েও কোনও বেআইনি কাজ হয়েছে বলে উত্তরপ্রদেশে কিংবা মধ্যপ্রদেশের প্রশাসন মনেই করে না।

পশ্চিমবঙ্গে দাপটের রাজনীতি আমদানি করতে গিয়ে তৃণমূল এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে ২০১৪ সালে এনআরএস মেডিকেল কলেজের টিএমসিপি-র বাহুবলীরা হোস্টেলে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে মেরে নিজেদের শক্তি জাহির করেও শাস্তি পায়নি। বরং যে ছাত্ররা ঘটনার বিরোধিতা করেছিল সে দিন তাদেরই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে। সম্প্রতি উদয়ন হোস্টেলের ঘটনায় একই জিনিস দেখা গেল। সমাজে মেধাবী বলে পরিচিত ছাত্রদেরও এমন নির্বিকার খুনি বানিয়ে দিতে পারে যে রাজনৈতিক পরিবেশ তা কতটা সর্বনাশা এই দুটি ঘটনাতেই পরিষ্কার নয় কি?

সাধারণ মানুষের ধারণাই হয়ে গেছে এলাকায় কোনও অপরাধ ঘটলে পুলিশের কাছে গিয়ে কিছু হবে না, বিচারের নামে দীর্ঘসূত্রতা চলবে, অপরাধীদের কোনও শাস্তিই হবে না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক সময় মানুষকে মরিয়া করে তোলে। তারা মনে করে কেউ যখন কিছু করবে না, আইনের শাসন যখন অলীক ব্যাপার আমাদেরই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। মানুষের এই অসহায় অবস্থা জানেন বলেই বলিউডের হিরো থেকে রাজনীতি জগতের হিরোরাও চোখা চোখা বাক্যবাণে অপরাধীদের সরাসরি নিকেশ করার নিদান দিয়ে হাততালি কুড়োন। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে বিজেপি তৃণমূল উভয় দলের নেতারাই 'উল্টো করে ঝুলিয়ে দেব', 'হাত পা কেটে নেব' এমন কত না হুঙ্কার দিয়েছেন। তাঁদের অনুগামী সহ সমাজের বড় অংশের মানুষের মধ্যে এর বিষময় প্রভাব তো থাকবেই।

এমনিতেই এ দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার আছে। গুজব রটানো, গুজবে বিশ্বাস করানোর কাজটা এতে আরও সহজ হয়ে যায়। গোটা সমাজে

ছয়ের পাতায় দেখুন

দণ্ডসংহিতা ঃ পুলিশকে ইচ্ছামতো গ্রেফতারির অধিকার

তিনের পাতার পর

আমৃত্যু ঠিকানা হল জেলখানা। জেলখানাকে সংশোধনাগার হিসেবে দেখার যে উন্নত চিন্তা বুর্জোয়া আইন কাঠামোতেই এসেছিল তা এখানে অর্থহীন করে দেওয়া হয়েছে।

৮৩টি ক্ষেত্রে জরিমানাও বিপুল বাড়ানো হয়েছে, বৃদ্ধির হার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১০০০ শতাংশ। মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বদলে আগের ১১টি ক্ষেত্র থেকে বাড়িয়ে ১৫টি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক উন্নত দেশগুলোতে ধীরে ধীরে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে অথচ ভারতের নতুন আইনে মৃত্যুদণ্ড বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা

পুরনো আইনে ছিল অভিযুক্ত একবার জেল হেফাজতে গেলে আর পুলিশ হেফাজতে ফিরিয়ে আনা যায় না। সিবিআই বনাম অনুপম জে কুলকার্নি (১৯৯২-'৯৩) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেছিল, তদন্তের প্রয়োজনে পুনরায় অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই করতে হবে। কিন্তু সুরক্ষা সংহিতার ১৮৭ ধারায় বলা হয়েছে জেল হেফাজত থেকে অভিযুক্তকে আবার পুলিশ হেফাজতে ফিরিয়ে আনা যাবে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৯০ দিন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নিদান রয়েছে। এতে হেফাজতে অত্যাচারের নৃশংসতা বাড়বে, এ আশঙ্কা অমূলক নয়। সুরক্ষা সংহিতার ১৭২ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির না করিয়েই ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত নাগরিককে আটকে রাখার (ডিটেনশন) সুযোগ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কোনও নাগরিক পুলিশের আদেশ না শুনলে পুলিশ তাকে আটকে রাখতে পারবে। বাস্তবে পুলিশকে যা ইচ্ছে তাই করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হল এই ধারায়।

সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় আছে, যেখানে বলা হয়েছে কোনও সভ্য সমাজে হাতকড়ার ব্যবহার চলতে পারে না। অথচ সুরক্ষা সংহিতার ৪৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে, পুলিশ চাইলে গ্রেফতার করার সময় হাতকড়া পরাতে পারে। মনে রাখতে হবে, অভিযুক্ত মানেই সে অপরাধী নয়। যে কোনও অভিযুক্তকে যখন হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন জনসমক্ষে তার সম্মানহানি হয়। বিচারের পর যখন যদি সে নির্দোষ প্রমাণিতও হয়, তবুও এ অসম্মানের দাগ তার গা থেকে মোছে না। এটা মানবাধিকার ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

গ্রেফতারের সময় থেকেই অভিযুক্তের সরকারি আইনি সহায়তা পাওয়ার কথা। নতুন আইনে তা-ও থাকবে না। একমাত্র বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারলে সরকারি সহায়তা মিলবে।

ললিতা কুমারী বনাম স্টেট অফ উত্তরপ্রদেশ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী পুলিশ এফআইআর করতে বাধ্য ছিল। সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩(৩) ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক তদন্তের আগে পুলিশ চাইলে এফআইআর না-ও করতে পারে। যে অপরাধ নিয়ে অভিযোগ, তা যদি তিন থেকে সাত বছরের সাজাযোগ্য হয়, তবে পুলিশ আগে অনুসন্ধান করবে, সন্তুষ্ট হলে তবে এফআইআর করবে। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী এবং অভিযোগকারী অসহায় হলে এমনিতেই পুলিশকে দিয়ে এফআইআর করানো কঠিন, আর এখন পুলিশের এফআইআর করার কোনও বাধ্যবাধকতাই রইল না। এতদিন পুলিশ যে সব বেআইনি কাজ করত, সেগুলোরই সব আইনি স্বীকৃতি নতুন আইন-পুস্তকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।

সুরক্ষা সংহিতার ৫৩ ধারায় পুলিশ হেফাজতে থাকা বন্দির প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা (পুরনো আইনে ছিল) বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। একবার দেখার পর ডাক্তার মনে করলে তবেই ফের পরীক্ষা হবে। পুলিশ লক আপে থাকা বন্দির কাছে পুলিশের মর্জি ছাড়া ডাক্তার পৌঁছবে কী করে? সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে এই আইনে রেজিস্টারে জিজ্ঞাসাবাদকারী পুলিশ অফিসারের নাম নথিভুক্তির ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অ্যারেস্ট মেমোতে সময় ও স্থান লেখার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও বাতিল করা হয়েছে। এতদিন সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে অভিযুক্তর পরিবারকে জানাতে হত, গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। সেটাও নতুন আইনে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বিচার প্রক্রিয়া না প্রহসন, বুঝে ওঠা দায়।

সুরক্ষা সংহিতার ৩৪৯ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হলে, কোনও ঘটনায় 'তদন্তের স্বার্থে' যে কোনও নাগরিককে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ভয়েস স্যাম্পল দিতে বাধ্য করতে পারবে, সেই নাগরিক কোনও মামলায় অভিযুক্ত না হলেও। নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। নাগরিক মাত্রই হবেন সন্দেহভাজন।

সুরক্ষা সংহিতার ৩৫৬ ধারায় বিচারপর্বে অভিযুক্ত 'পলাতক' হলেও, তার অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়ে যাবে। এমনকি সাজা ঘোষণাও হয়ে যাবে। পুলিশ চাইলে কাউকে আদালতে হাজির না করেই, এমনকি তাকে না জানিয়েই 'পলাতক' বলে দিতে পারে, সে সম্ভাবনাও থেকেই যাচ্ছে। একেই বোধহয় বলে 'একুশে আইন'।

অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের অন্যতম উপায় সাক্ষীদের জেরার সুযোগ। সুরক্ষা সংহিতার ৩৩০ ধারায় সেই সুযোগও সংকুচিত করা হয়েছে। তদন্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট নেওয়া হলেও, বিচার পর্বে সেই বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য দিতে নাও ডাকা হতে পারে। সেটা নির্ভর করবে বিচারকের মর্জির উপর।

বিচারের ঢের আগে তদন্ত পর্বেই বন্দি অভিযুক্ত সম্পর্কে পুলিশ ছবি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে। নাগরিকের মানবিক মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার এই আইন রয়েছে সুরক্ষা সংহিতার ৩৭ ধারায়। বিচারে অভিযোগ ভুল প্রমাণ হলে তার সামাজিক সম্মান কি ফিরে পাওয়া যাবে? এ ক্ষেত্রে আইনে কিন্তু পুলিশের কোনও শাস্তির সংস্থান নেই।

সুরক্ষা সংহিতার ১০৭ ধারা অনুসারে তদন্ত চলা অবস্থাতেই কারও কোনও সম্পত্তি 'অপরাধের সূত্রে প্রাপ্ত' বলে পুলিশের মনে হলে, কোর্টের অনুমতি নিয়ে তা বাজেয়াপ্ত করা যাবে। জেলাশাসকের মাধ্যমে বিলিবণ্টনও করে ফেলা যাবে। ভেবে দেখুন, এটা ঘটবে তদন্ত চলাকালীন, বিচারে অপরাধ প্রমাণের আগেই। এমনকি বিচার শেষ হওয়ার আগে (সুরক্ষা সংহিতা ৪৯৭) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ছবি তুলে ১৫ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট। বিচার নয়, যথেচ্ছ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে।

পুলিশ অভিযোগ না নিলে, এতদিন অভিযোগ জানানোর অন্যতম বিকল্প পথ ছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হওয়া। অভিযোগকারী ও তার তরফে সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে ম্যাজিস্ট্রেট মামলা গ্রহণ করতেন। নতুন সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩(৩), ১৭৫(৩,৪), ২২৩ ধারায় রয়েছে, অভিযোগ যদি পুলিশ বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে হয়, তা হলে ম্যাজিস্ট্রেটকে আগে শুনতে হবে অভিযুক্ত ও তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের বক্তব্য। সেই ব্যাখ্যা শোনার পর ম্যাজিস্ট্রেট চাইলে মামলা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

নতুন আইনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার, কোনও জমায়েত নিষিদ্ধ করার জন্য 'সশস্ত্র বাহিনী'-কে আদেশ দেওয়ার অধিকার ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কোনও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তিনি বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন। জমি সংক্রান্ত মামলায় হস্তক্ষেপ করে, ব্যক্তির জমির অধিকারও কেড়ে নিতে পারবেন।

পুরনো ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৬(এ) ধারায় লম্বা সময় বিচারাধীন বন্দি কেউ সম্ভাব্য সাজার মেয়াদের অর্ধেক পেরোলেই জামিন পাওয়ার (ডিফল্ট বেল) অধিকারী হতেন। বিলম্বিত বিচারে নাগরিকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া প্রতিরোধের উপায় ছিল এটা। নতুন সুরক্ষা সংহিতার ৪৭৯ ধারায় এখন থেকে শুধুমাত্র প্রথমবার অভিযুক্ত বন্দিরাই এই সুযোগ পাবে। ফলে বিচার শেষের আগেই বন্দি হয়ে থাকার মেয়াদ আরও লম্বা হবে। অসংখ্য বিচারাধীন বন্দির ভিড়ে উপচে পড়বে জেলখানা। আইনে বলছে, যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এমন মামলায় বিচারাধীন বন্দি ডিফল্ট বেল চাইতেই পারবেন না। অথচ হয়তো বিচার শেষে দেখা যাবে সেই বন্দি নিরপরাধ। ততদিনে জেলেই কেটে গিয়েছে ১৪-১৫ বছর। বিনা দোষে লম্বা জেল খাটতে হলেও, নাগরিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ কিন্তু আইনে নেই। অক্ষরধাম কেসে সুপ্রিম কোর্ট, বিনা দোষে এক বছর জেলে থাকার জন্য এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছিল। নতুন আইনে সেই ক্ষতিপূরণ মাত্র ১ হাজার টাকা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এতে ভুয়ো গ্রেফতারির সংখ্যা অসংখ্য বেড়ে যাবে। বাড়বে জনসাধারণের হয়রানি।

এটা স্পষ্ট যে, নতুন আইনের নাম ন্যায় সংহিতা, সুরক্ষা সংহিতা হলেও সামাজিক ন্যায় ও নাগরিক সুরক্ষা থেকে আইনগুলি শত যোজন দূরে। সমস্ত আইন জুড়ে শুধুমাত্র প্রশাসনিক আদেশের কথাই আছে। ফৌজদারি আইনে যে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাজা দেওয়ার কথা ছিল, নতুন ধারা নতুন শব্দ নতুন বাক্যবন্ধের মধ্য দিয়ে তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবাধিকার ধ্বংস করার সিংহদুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম

এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর পরিবর্তে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের মূল পরিবর্তনটা হল, প্রযুক্তি ব্যবহারে বিপুল গুরুত্ব আরোপ। পুলিশ মোবাইলে জবানবন্দি নেবে এবং ভিডিও-তে কথোপকথন রেকর্ড করবে, সেটাই তথ্য প্রমাণ হিসেবে বিচার প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ধরতে হবে। সাক্ষীর বয়ান বা অভিযুক্তের জবানবন্দির ভিডিও পুলিশ কোথায় তুলছে, কী ভাবে তুলছে জানা যাবে না। কারণ সেখানে আইনজীবী উপস্থিত না-ও থাকতে পারেন। দূর থেকে বন্দুকের নল তাক করে সাক্ষীর বয়ান বা অভিযুক্তের জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে কি না, এর মীমাংসা করার কোনও উপায় নেই।

সাক্ষ্য অধিনিয়মে ভার্চুয়াল ট্রায়াল ও ভিডিও মাধ্যমে বিচারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে অভিযুক্তের আইনজীবী ভাল করে জেরাই করতে পারবেন না সাক্ষীদের। মনে রাখতে হবে, জেরা পর্বে সাক্ষীর শরীরী ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ, যা বোঝার কোনও উপায় থাকবে না।

সাক্ষী ও তদন্তকারী অফিসারদের আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে না হলে অনেকখানি সময় বেঁচে যাবে— এই যুক্তি কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কারণ বর্তমানে বিচার প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে, বিনা বিচারে অসংখ্য মানুষকে বন্দি থাকতে হয়। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। কোর্টগুলির অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, বিচারপতির অভাব ও সরকারি দলের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতায় বিচার বিলম্বিত হয়। ২০০৫ সালে দ্রুত বিচারের জন্য ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করা হয়েছিল। সেই ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টগুলোর অবস্থা কী? শীর্ষ থেকে নিম্ন সব আদালতেই বিচারকের অভাবে ভুগছে। দ্রুত বিচার সরকারের উদ্দেশ্য হলে সেখানে পরিকাঠামো উন্নত করা, অর্থবরাদ্দ করা— এগুলো সরকার করত। অথচ তা না করে, আধুনিকীকরণের নামে একেবারে কাঠামোটাই পাল্টে দেওয়া হল।

ন্যায় শাস্ত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বুনিয়াদি নীতিগুলি বলে, (১) অভিযোগ প্রমাণ না করে কাউকে সাজা দেওয়া যাবে না, (২) অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। (৩) যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নির্দোষ এবং অভিযোগ প্রমাণ করার দায় অভিযোগকারীর। (৪) জামিনই নিয়ম, বন্দি রাখা ব্যতিক্রম। নতুন আইনে এই নীতিগুলির কোনও প্রতিফলন নেই। বরং ন্যায় বিচারের ও গণতন্ত্রের যতটুকু ছিটেফোঁটা, অন্তত খাতায়-কলমে হলেও ছিল, নতুন আইন চালু হওয়ায় তা-ও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ভারত পরিণত হবে একটা পুলিশি রাষ্ট্রে। আইনগুলি থেকে স্পষ্ট, ব্রিটিশ ভারতে দেশবাসী সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্বাধীন ভারতেও নাগরিকদের সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিন্দুমাত্র বদলায়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ দেশের সরকারগুলি জনস্বার্থবিরোধী মালিকতোষণ নীতি নিয়ে চলেছে। বিগত ১০ বছরে তারই কুৎসিত প্রকট রূপ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। অত্যাচারিত নিষ্পেষিত মানুষ গমকে গমকে ফেটে পড়ছে বিদ্রোহে বিক্ষোভে। একে প্রতিহত করার জন্য, সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, আইন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। নতুন তিনটি আইন এই ধারাবাহিকতারই সাম্প্রতিক রূপ। এই অগণতান্ত্রিক, মানবাধিকার বিরোধী আইনগুলিকে প্রত্যাহার করাতে সরকারকে বাধ্য করতে হলে, একে প্রতিহত করতে হলে, দেশব্যাপী জনমত সংগঠিত করে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

এই আইন পাশের পরেই এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে

বিশাল ছাত্র সমাবেশের ডাক

৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতা

নিট ইউজি ও পিজি এবং ইউজিসি ও সিএসআইআর নেট পরীক্ষায় দুর্নীতির সব অভিযোগের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি ও এনটিএ বাতিলের দাবিতে ৪ জুলাই সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছিল এআইডিএসও। এ দিন কলকাতায় হাজরা মোড়ে মিছিল হয়, কলেজ স্ট্রিটে মিছিল ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্য জুড়ে অবরোধ, বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ সভা হয়। কলেজ স্ট্রিটে মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়।

ওই দিনই বিকেলে সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বলেন, দেশ জুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম দুর্নীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় সংস্থা এনটিএ পরিচালিত সমস্ত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলিতে যে চরম দুর্নীতি হয়েছে তা সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চরম হতাশা তৈরি করেছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষায় দুর্নীতি আর অন্য দিকে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বেনিয়ম, স্বজনপোষণ দুর্নীতি গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। রাজ্যে ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে, পাশ-ফেল নেই, উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ড পরীক্ষা তুলে দিয়ে চালু হচ্ছে সেমেস্টার, শিক্ষকের অভাবে হাজার হাজার স্কুলে ক্লাস হচ্ছে না, গড়ে উঠছে অসংখ্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

কলেজে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ, গণতান্ত্রিক ভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে, মেডিকেল শিক্ষায় 'সিবিএমই' এবং 'নেক্সট' পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ও মহামিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

ছাত্র সমাবেশ ও মহামিছিলের প্রস্তুতি পর্বে জুলাই-আগস্ট দু-মাস জুড়ে সারা রাজ্যে ১ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করা হবে। এই কর্মসূচির বার্তা নিয়ে রাজ্যের ১৫,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচার হবে। কর্মসূচির সমর্থনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেট থেকে রাজপথ রাজ্য জুড়ে ৬,০০০ সভা হবে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ল-কলেজ, প্যারামেডিকেল, নার্সিং কলেজ, প্রাইভেট কলেজ, মেস, হোস্টেল সহ সব মিলিয়ে এই দু-মাসে ৫,০০০ 'সরকারি শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' গঠন করা হবে। স্কুল- কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপকভাবে যুক্ত করে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করতে গণঅঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২৯ জুলাই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সর্বজনীন শিক্ষার জনক বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে সরকারি স্কুল বন্ধের প্রতিবাদে এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে 'সারা বাংলা অঙ্গীকার দিবস' পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সংগঠন। ১১ আগস্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে বিপ্লবীদের স্বপ্নপূরণ, শিক্ষার অধিকার রক্ষার্থে 'দেশ বাঁচাও শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালন করবে এআইডিএসও।

বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পৌরসভায় বিক্ষোভ

পাঁশকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে ২৬ জুন মাইকে ঘোষণা করা হয়, মেদিনীপুর ক্যানেলের দুই পাড়ে সরকারি সেচ দপ্তরের জায়গায় বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উঠে যেতে হবে। না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ফতোয়ার পরই এলাকায় বসবাসকারী পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

২৮ জুন পাঁশকুড়া পৌরসভায় বস্তি উন্নয়ন কমিটির ডাকে সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ দেখান ও গণডেপুটেশন দেন। তাঁরা পৌরসভার সামনে স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রমীলা জানা, ইশানা বিবি, রূপালী আচার্য, মঞ্জুরা বিবিরা বলেন, আমরা গরিব মানুষ। মজুর খেটে, লোকের বাড়িতে কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালাই। আমাদের জমি জায়গা নেই। ক্যানেল পাড় থেকে উচ্ছেদ করলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমরা কোথায় যাব। যে কোনও মূল্যে আমরা এই উচ্ছেদ রুখব। পৌরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন ডেপুটেশন গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এখনই কোনও উচ্ছেদ হবে না। আগে সার্ভে করা হবে। উচ্ছেদ করতে হলে আগে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দীপঙ্কর মাইতি, লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা, কার্তিক বর্মন, বিনয় শাসমল, সিক্তা মাজি প্রমুখ।

মৈপীঠে কমরেড সুধাংশু জানা স্মরণে স্বাস্থ্যশিবির

এসইউসিআই(সি)-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৈপীঠের বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সুধাংশু জানার শহিদ দিবস পালিত হল ৪ জুলাই। মৈপীঠ পাঁচমাথা মোড়ে শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। স্বাস্থ্যশিবিরে দু-শোর বেশি মানুষের চিকিৎসা হয়। বিকালে শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার।

মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

কলকাতা ঃ মোবাইল রিচার্জ এবং ডাটা প্যাক মাশুল ১২ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্ব কলকাতার

কলকাতা

এসপ্ল্যানেডে স্টেটসম্যান হাউস থেকে একটি মিছিল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই) দপ্তরের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল, রাজ্য নেতা সঞ্জয় বিশ্বাস, সমর চ্যাটার্জী। মাশুল বৃদ্ধির সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। সঞ্জয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধিদল ট্রাই দপ্তরের আধিকারিকদের ডেপুটেশন দেন।

কৃষ্ণনগর

রাজ্য সম্পাদক বলেন, বিপুল পরিমাণে লাভ করে চলা এই সংস্থাগুলি আরও লাভ করার উদ্দেশ্যে অত্যধিক চার্জ সাধারণ গরিব মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে যা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। আবার কেন্দ্রীয় সংস্থা ট্রাই, যাদের গ্রাহকস্বার্থ দেখার কথা, তারা এই মূল্যবৃদ্ধিকে নীরবে সমর্থন করেছে এবং বাস্তবে কর্পোরেটদের হাতকেই শক্ত করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে 'গ্রাহক কমিটি' গড়ে গ্রাহকদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানানো হয়।

কৃষ্ণনগর ঃ ২ জুলাই নদিয়ায় কৃষ্ণনগর বেলেডাঙা মোড়ে রেলগেটের সামনে একটি বিক্ষোভ সভা এবং মোবাইলের চার্জবৃদ্ধির সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী।

দিল্লি ঃ মোবাইল রিচার্জ এবং ডাটা প্যাক মাশুল ১২ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৩ জুলাই ট্রাই-এর দিল্লির কেন্দ্রীয় অফিসে গণ ই-মেল-এর কর্মসূচি নেওয়া হয় এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক অমরজিৎ কুমার বলেন, মোবাইল পরিষেবাকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদী ই-মেল পাঠিয়েছেন। এরপরও কোম্পানিগুলি বর্ধিত দাম প্রত্যাহার না করলে 'মোবাইল ইউজারস ফোরাম' গঠন করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম বৃদ্ধি, মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধি, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো, নিট কেলেঙ্কারি, উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়াই হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় গণবিক্ষোভ। ১ জুলাই

পাঠকের মতামত

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

মোবাইল ফোন আমাদের জীবনে ভীষণই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কর্মক্ষেত্র এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও আজ মোবাইল ছাড়া অচল। আমাদের যাবতীয় পরিচয়পত্র সহ ব্যাঙ্ক, রান্নার গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিতে একটি রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর রাখা আবশ্যিক। অথচ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা বিএসএনএল-এর মতো সরকারি সংস্থার পরিকাঠামো ও সম্পত্তি বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়া হচ্ছে। আজ অন্য সব পরিষেবার মতো ফোন পরিষেবাকেও বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা পুঁজিপতিদের মুনাফার খুবই লোভনীয় ক্ষেত্র। ইচ্ছাকৃতভাবেই বিএসএনএল-এর পরিষেবাকে রুগ্ন করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারি পরিষেবা নিতে। তাই মুনাফা, আরও মুনাফার জন্য জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন-এর মতো মোবাইলের নেটওয়ার্ক ব্যবসায়ীরা একচেটিয়াভাবে তাদের মাশুল বাড়িয়েই যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে রিলায়েন্স জিও কোম্পানি বিনামূল্যে ইন্টারনেট ও আনলিমিটেড ভয়েস কলের পরিষেবা দিয়ে মানুষকে ইন্টারনেটের নেশায় আসক্ত ও অভ্যস্ত করে দিয়েছে। এখন ইচ্ছামতো বিল বাড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ তীব্র করছে। একটা পরিবারে যদি চার জন সদস্য থাকেন, তা হলে সকল সদস্যের মোবাইল বিলের জন্য মাসে প্রায় হাজার টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

একদিকে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশা বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব বাড়ছে, বাড়ছে জিনিসের দাম। কমছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। তার উপর এই মোবাইল রিচার্জের মাশুল বৃদ্ধি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের সমান। মোবাইলের এই প্রতিদিনের দেড় জিবির ইন্টারনেট যুবকদের বেকারত্বের জ্বালা ভুলিয়ে দিচ্ছে, আফিমের মতো একপ্রকার নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখছে ছাত্র-যুবদের। ইন্টারনেটে অসংখ্য রিল-ভিডিও, অনলাইন গেম, অশ্লীল সিনেমা-ছবি-ভিডিও কেড়ে নিচ্ছে সুন্দর শৈশব-কৈশোর-যৌবন। নিষ্পাপ শিশুরাও রক্ষা পাচ্ছে না এর করাল গ্রাস থেকে।

রিলায়েন্সের মতো পুঁজিপতি কোম্পানি যারা সদ্যসমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি, তৃণমুল কংগ্রেস, কংগ্রেস সহ শাসক দলগুলিকে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল, আজ সেই টাকা তারা জনগণের ঘাড় ভেঙে উসুল করে নিচ্ছে। টেলিকম রেগুলেটারি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই) -এর মতো সরকারি সংস্থা যাদের কাজ মাশুল বৃদ্ধি সহ টেলিকমিউনিকেশন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে কাঠের পুতুল বানিয়ে রেখে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে ইচ্ছেমতো মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

মহম্মদ মহিউদ্দিন রেজা
কলকাতা- ৭০

আইন মেনে পুনর্বাসন চাই

সময় বদলায়, শাসক বদলায়, দলবদল হয়, কিন্তু শাসকের চরিত্রের বদল হয় না। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার এ এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়, পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। একদিন মধ্যরাতে পুলিশ ও কলকাতা করপোরেশনের যৌথ নেতৃত্বে শুরু হয় শহরের একুশটি রাস্তা থেকে হকার উচ্ছেদ অভিযান। রাতভর অভিযানে গড়িয়াহাট, লেক মার্কেট, কালীঘাট, হাতিবাগান, বিধান সরণি, ধর্মতলা, ডায়মন্ডহারবার রোডের একের পর এক হকারের স্টল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বুলডোজারের আঘাতে। রুজি-রুটি হারা হন কয়েক হাজার হকার। কলকাতার ইতিহাসে এই ঘটনা কুখ্যাত 'অপারেশন সানসাইন' নামে পরিচিত।

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থেকেছে শহর কলকাতা। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এখন তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু হকার উচ্ছেদ নিয়ে সরকারি নীতির পরিবর্তন হয়নি। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সরকার বদলালেই, মানুষের সমস্যার সমাধান হয় না।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর শহর জুড়ে শুরু হয়েছে হকার উচ্ছেদ অভিযান। একদিকে সরকার, পুলিশ-প্রশাসন আর অন্যদিকে গরিব, অসহায় হকার। অভিযোগ— বেআইনি ভাবে ফুটপাত জবরদখল করে আছে হকাররা। অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে পথচলতি মানুষদের। কলকাতার সৌন্দর্যায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে হকাররা, বড় বড় উড়ালপুল, শপিংমল, আর বাতিস্তম্ভের ভিড়ে তারা বড়ই বেমানান। তাই গত কয়েক দিনে কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া, কোনও রকম পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া, বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হয়েছে একের পর এক হকারের স্টল। রুজি-রুটির শেষ সম্বলটুকু হারালেন হাজার হাজার হকার। সাথে সাথে এই হকারদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের মানুষগুলোর উপর হঠাৎই নেমে এল অনিশ্চয়তার গভীর অন্ধকার।

কোনও সচেতন নাগরিক ফুটপাত জবরদখল সমর্থন করে না। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় মানুষগুলো ফুটপাতে দোকান খুলতে বাধ্য হয়েছে সে কথাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার বেকার, একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাঁটাই, লে-অফ রোজকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের চিত্রটাও এর থেকে আলাদা কিছু নয়। এমন এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে গরিব মানুষের কাছে হকারি করা ছাড়া, সৎ পথে উপার্জনের আর কোনও বিকল্প সুযোগ কী আছে? ফলে একে আইনি সমস্যা বলা ভুল, এ এক মানবিক সমস্যা।

সরকার যখন কাজ দিতে পারছে না তখন হাজার হাজার মানুষ দু'মুঠো খাবারের জোগাড় করতে ফুটপাতে দোকানপাট করলে তাকে মানবিক দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। উচ্ছেদের প্রয়োজন হলে আগে পুনর্বাসন দিয়েই করতে হবে। দেশের নাগরিকদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র কোনও অজুহাতেই এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ আইনবিরুদ্ধ, অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক।

তাই 'হকার আইন ২০১৪' অনুযায়ী উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবিতে এবং কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সঠিক নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী হকার আন্দোলনের পাশে সমস্ত পেশার খেটে-খাওয়া মানুষকে দাঁড়াতেই হবে।

সৌভিক সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

তিন দমনমূলক আইন বাতিলের দাবিতে কালা দিবস পালন আইনজীবীদের

লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের আনা নতুন তিন কালা আইন বাতিলের দাবিতে

১ জুলাই দিনটি ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র রক্ষা ও মানবাধিকার সম্প্রসারণ দিবস হিসাবে রাজ্য জুড়ে পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদালতের আইনজীবী ও বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কালা দিবস পালিত হয়। এ দিন প্রায় সমস্ত কোর্টেই কাজকর্ম বন্ধ ছিল। ছবি ঃ মেদিনীপুর কোর্ট

বাঁকুড়ায় সিপিডিআরএস-এর সভা

বাঁকুড়ায় মানবাধিকার হরণের নানা ঘটনার প্রতিবাদে ২৯ জুন ডিওসি হলে সিপিডিআরএস-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুব্রত সিংহ। এক আদিবাসী স্কুলছাত্রীর উপর গণধর্ষণে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান বক্তারা। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস নিট-কেলেঙ্কারির তীব্র নিন্দা করেন। সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন বলেন, কেন্দ্রের তিন কালা ফৌজদারি আইনের মাধ্যমে দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি সরকার। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। সভা পরিচালনা করেন বাঁকুড়া কোর্টের আইনজীবী কমিটির জেলা সহসভাপতি অ্যাডভোকেট হরিদাস ব্যানার্জী।

গণপ্রহার রুখতে সরকার কি আন্তরিক

তিনের পাতার পর

যখন যুক্তিহীনতা, অন্ধ বিশ্বাসের বাতাবরণ গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তখন তার বিষে জর্জরিত মানুষগুলিকে গণপ্রহারে সামিল করা অনেকটা সহজ কাজ। এ দেশে বিজেপি, তৃণমূল বা কংগ্রেসের মতো পরিচিত দক্ষিণপন্থী দলগুলো তো বটেই এমনকি সিপিএমের মতো বামপন্থী বলে দাবি করা দলও নিজেদের আখের গোছানোর স্বার্থে নিজেদের প্রভাবে থাকা মানুষের মধ্যে যুক্তিহীন অন্ধত্ব তৈরি করতে চায়। এই অন্ধ চিন্তার বাতাবরণ দলীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজে প্রভাব ফেলে। এই বাতাবরণে মানুষকে মিথ্যা অভিযোগে ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগ পায় দুষ্ট শক্তি। যে সব নেতারা এই অসুস্থ বাতাবরণ সমাজে তৈরি করার জন্য দায়ী গণপিটুনির দায়ও তাদেরই নিতে হবে তো!

এরই সঙ্গে আজ পশ্চিমবঙ্গে উঠে আসছে শাসক দলের নেতাদের মদতে সালিশি করে সমস্যা মেটানোর নামে মানুষের ওপর অত্যাচারের কথা। চোপড়ার ঘটনা নিয়ে বেশি হইচই হলেও এমন ঘটনা যে সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে আছে তা মানুষের জানা। কত মর্মান্তিক মৃত্যুও এর সাথে জড়িয়ে আছে! উত্তরভারতের কুখ্যাত খাপ পঞ্চায়েতের মতোই শাসক দলের নেতারাই নিতান্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিসরেও নাক গলিয়ে এই অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এখন উঠে আসছে এই সালিশি এবং অত্যাচারের পিছনে থাকা স্তরে স্তরে নেতাদের দুর্নীতি, জমি দখল, অবৈধ নানা কারবারের স্বার্থের কথা। তৃণমূলের ছোট থেকে বড় সব স্তরের নেতাদের লাগামহীন দুর্নীতি মানুষকে এতটাই অতিষ্ঠ করে তুলেছে যে মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত নিজের দলের নেতা-মন্ত্রী-কাউন্সিলার-পঞ্চায়েত কর্তাদের বিরুদ্ধে 'টাকা খাওয়া'র কথা প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে! যদিও চোপড়ার তৃণমূল নেতা 'জেসিবি'-র মতো অনেক নেতাই যে বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তা কি মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারবেন? তিনি যে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন তা বহু আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তাঁর পূর্বসূরী সিপিএম সরকার এ সব কাজ যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকে শুরু করে তিনি এর ব্যাপ্তিটা বাড়িয়েছেন। সিপিএম আমলে গ্রামে শহরে পাড়ায় পাড়ায় এই জিনিসই একটু অন্য রূপে ছিল। তখন দেখা যেত শাসক পার্টির স্তরে স্তরে নেতারা দুর্নীতি ও দাপটকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তৃণমূলের আমলে সেটা কিছুটা লাগামহীন। মাত্রা আর ব্যাপ্তির হেরফের ছাড়া বিশেষ তফাত নেই।

প্রশাসন পুলিশ চাইলে এর ওপর কিছুটা হলেও লাগাম পরাতে পারে। কিন্তু নিছক কিছু নতুন আইনেই তা হবে না। প্রয়োজন শাসকদের সদিচ্ছা। সে সদিচ্ছার অভাব এতটাই প্রকট যে তা ফিরিয়ে আনতে একটাই পথ খোলা— সাধারণ মানুষের সচেতন সংঘবদ্ধ ভূমিকা। এই ভূমিকাই একমাত্র প্রশাসনকে বাধ্য করতে পারে কিছুটা হলেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে যথাযথ ভূমিকা নিতে।

সস্তা তেলের সুবিধায় বঞ্চিত জনগণ

সরকারি মদতে বিপুল লুট তেল কোম্পানিগুলির

আধুনিক সভ্যতায় তেল প্রাণিদেহে রক্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ। এর গতি যত অপ্রতিহত থাকে সভ্যতাও ততখানি সচল থাকে। পরিবহণ জ্বালানি হিসাবে তেল প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দু'ভাবেই গভীর প্রভাবিত করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে। অথচ সেই তেল নিয়ে কী করছে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি? সরকারি মদতে দেশের মানুষের উপর কার্যত অবাধ লুঠ চালাচ্ছে তারা।

তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা— ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি), ভারত পেট্রলিয়াম (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রলিয়ামের (এইচপিসিএল) মিলিত মুনাফা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পৌঁছল ৮১ হাজার কোটি টাকায়। বেসরকারি কোম্পানিগুলি মুনাফা করেছে আরও বেশি। বাস্তবে নজিরবিহীন এই মুনাফা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের নিচু দাম এবং রাশিয়ার তেল অতি সস্তায় পাওয়ার সুবাদেই কোম্পানিগুলির এই বিপুল মুনাফা। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের কাছে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা তেলের সুবিধা সাধারণ মানুষকেও একই রকম ভাবে পেতে দিতে হবে। তেলের দাম কমলে পরিবহণ খরচ কমে গিয়ে যেমন তা মুল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এনে সঙ্কটগ্রস্ত জনজীবনে অনেকখানি সুরাহা আনতে পারত, তেমনই কৃষিক্ষেত্রেও সেচের খরচ কমলে কৃষকদের চাষের খরচ অনেকখানি কমত।

২০২২-এ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মার্চে অশোধিত ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ১৪০ ডলারে পৌঁছয়। সেই সময়ে তেল কোম্পানিগুলি ভারতীয় বাজারে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯০ টাকার আশেপাশে এবং পেট্রলের দাম বাড়িয়ে লিটার প্রতি ১০০ টাকার আশেপাশে তুলে নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম গত বছরের এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে অর্ধেকে (৭২ ডলার) নেমে আসে এবং পরে তা সামান্য বাড়লেও ৮০ থেকে ৮৫ ডলারের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। অথচ দেশের বাজারে কোম্পানিগুলি তেলের দাম একই রকম চড়া রেখে দেয়। ফলে জনগণ কম দামের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু কোম্পানিগুলি বিপুল মুনাফা লুটে নেয়।

এ তো গেল আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা তেলের সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার বিষয়টি। এ ছাড়াও রয়েছে রাশিয়া থেকে অতি সস্তায় তেল আমদানি করে মুনাফা লুটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই আমেরিকা রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যে তার তেল-গ্যাস রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে ন্যাটোর আওতাভুক্ত ইউরোপের দেশগুলি, যারা রাশিয়ার তেল-গ্যাসের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল সেখানে রাশিয়ার তেল রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। অথচ রাশিয়ার অর্থনীতি তেলের ব্যবসার উপর অনেকখানিই নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের থেকে অনেক কম দামে তেল বিক্রির প্রস্তাব দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১৪০ ডলারে পৌঁছে গেলেও রাশিয়া ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে মাত্র ৪০ ডলারে, এমনকি তার থেকেও কম দামে তেল দিতে রাজি হয়। এই সুযোগ কাজে লাগায় ভারত সরকার। বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়ার তেল অতি সস্তায় আনতে থাকে।

ভারত তার প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারত ইরাক এবং সৌদি আরব থেকেই বেশির ভাগ তেল আমদানি করত। রাশিয়া থেকে আমদানি করত মাত্র ০.২ শতাংশ তেল। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতের ৩৫ শতাংশ তেলই এসেছে রাশিয়া থেকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসেছে আগের বছরের থেকেও ৫৭ শতাংশ বেশি। এই অতি সস্তার তেল

- **২০২৩-'২৪ অর্থবছরে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির মুনাফা হয়েছে ৮১ হাজার কোটি টাকা।**
- **রাশিয়া থেকে ৪০ ডলার, এমনকি আরও কমে তেল কিনে কোম্পানিগুলি বিক্রি করছে চড়া দামে। বিপুল মুনাফার সুবিধা পাচ্ছে দেশের একচেটে পুঁজিগোষ্ঠীগুলি। জনগণের জন্য বরাদ্দ শুধুই জিনিসপত্রের চড়া দাম।**

শোধন করে বেসরকারি কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের দামে ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেছে। ফলে বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা আকাশ ছুঁয়েছে। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই সস্তা তেলের কোনও সুবিধা দেশের জনগণকে পেতে দেয়নি।

দেশের অভ্যন্তরের খনিগুলি থেকে যে সব সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলি তেল তুলে আন্তর্জাতিক বাজারের চড়া দামে দেশে এবং বিদেশে বিক্রি করে তাদের সেই বিপুল মুনাফার উপর সরকার মাঝে মাঝে 'পড়ে পাওয়া' (উইন্ড ফল) ট্যাক্স চাপায়। জনগণের চোখে ধুলো দিতে এই ট্যাক্স মাঝেমধ্যে চাপালেও প্রায় তা তুলে নেওয়া হয়, না হলে নামমাত্র নেওয়া হয়।

কারও কারও ধারণা, রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলির মুনাফা তো দেশের কল্যাণে তথা জনগণের কল্যাণের কাজেই লাগে। ফলে ঘুরপথে তা জনগণকেই সুরাহা দেয়। বাস্তবে যারা এমন করে ভাবেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা নেই, থাকলেও তা অত্যন্ত ভাসাভাসা। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু বাদ দিলে রাষ্ট্রীয় পুঁজির বাকি সমস্ত অর্থই খরচ হয় পুঁজিপতি শ্রেণি, মূলত একচেটিয়া পুঁজির সেবায়। সরকার এই টাকায় পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেয়, ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে তাদের শোধ না করা বিরাট অঙ্কের এনপিএ মিটিয়ে দিতে প্রতি বাজেটে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ করে এবং এই ঋণ খেলাপির হিসাব ব্যাঙ্কের খাতা থেকেও মুছে ফেলে। এই টাকায় সরকার পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের ব্যবসার জন্য, শিল্প স্থাপনের জন্য সস্তায় বা বিনামূল্যে জমি, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তঘাট, রেললাইন প্রভৃতি নানা ভাবে পরিকাঠামো গড়ে দেয়। পুঁজিপতিরা প্রায়ই আর্থিক সঙ্কটের মায়াকান্না কাঁদে এবং সরকার সেই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের নামে লক্ষ কোটি টাকার 'ত্রাণ-প্যাকেজ' ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে তাদের খয়রাতি দেয়।

লক-ডাউনের সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে তেলের ব্যবহার প্রায় শূন্যে নেমে এসেছিল, তখন বিদেশ থেকে বিনা খরচে তেল আমদানির সুযোগ পেয়েছিল তেল কোম্পানিগুলি। সেই তেল মজুত রাখার জন্য ভারত সরকার বিরাট আয়তনের দুটি ভূগর্ভস্থ তেল মজুত ভাণ্ডার গড়ে দিয়েছিল। একটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম বন্দরে এবং অপরটি কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর বন্দরে। সম্প্রতি সরকার রাশিয়ার সস্তা তেল মজুত করার জন্য আরও বড় একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে দিচ্ছে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে পিপিপি মডেলে। যার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৫৫১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার তার রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে মিটিয়ে দেবে ৩৩০৮ কোটি টাকা। বিপরীতে জনগণের জন্য সরকার ব্যয় করে ছিটেফোঁটা। এমনকি শিক্ষা-স্বাস্থ্যের জন্য এতদিন যতটুকু বরাদ্দ করছিল এখন সেটুকুও বাতিল করে দিচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার সঙ্গে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। আর বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি, যারাই তেল থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করছে, কার্যত তারাই সরকারের তেল-নীতি তৈরি করে দেয়, এমনকি তেলমন্ত্রী কে হবে, তা-ও তারা ঠিক করে দেয়। বাস্তবে সরকারগুলি এই সব কোম্পানি তথা ধনকুবেরদের তল্পিবাহক মাত্র। তাই সরকার তাদের মুনাফা ছেঁটে জনগণকে সুবিধা দেওয়ার কথা বলতেই পারে না। কারণ, সরকার কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে না, উল্টে কোম্পানিগুলিই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটাই পুঁজিবাদ।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতির প্রভাব খর্ব হওয়ার লক্ষণ দেখা দিত এবং তাদের মধ্যে একটা নতুন উন্নততর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের প্রতিফলন আমরা দেখতে পেতাম। অথচ বাস্তবে এর উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনাই কি প্রমাণ করে না যে, এরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নামে যে জিনিসের চর্চা এ দেশে করছে, তা আসলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ নয়। যে কোনও যুগে যে কোনও বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শের আসল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে। সেইরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব ও পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের সর্বোচ্চ স্তরের মানবতাবাদী সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণার চেয়েও উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিক মান অর্জন করার মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের মূল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা, এটি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই উপরোক্ত বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের হাতে পড়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হয়ে পড়েছে অনেকটা প্রাণহীন দেহের মতো। প্রাণহীন দেহের মতোই এইসব তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সমাজজীবনে অবস্থান ও প্রভাববৃদ্ধি সমাজের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমেই ক্ষতিসাধন করে চলেছে। ফলে এই সমস্ত তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলোর নেতৃত্বাধীনে যতদিন পর্যন্ত দেশের গণআন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন পরিচালিত হবে, ততদিন দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যত মারমুখী লড়াই-ই পরিচালনা করা হোক না কেন, শুধুমাত্র তার দ্বারা সাধারণভাবে জনতার মধ্যে এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মানের ক্রমাবনতির এই ধারাকে কোনও মতেই রোখা যাবে না। আর, দেশের জনসাধারণ যদি এই ভাবে নিম্নতম সংস্কৃতির, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও সামন্তী সংস্কৃতির দাসই থেকে যায়, তা হলে যে কোনও সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিফলতা ও দেশজোড়া হতাশার মুখে তারা প্রতিক্রিয়ার শিকার বনে যেতে পারে এবং শেষপর্যন্ত এমনকী প্রতিক্রিয়ার হাতে বিপ্লববিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে যেমন— আমরা ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি।

এ ছাড়া, মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও— সমস্ত নেতারই বক্তব্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করতে না পারলে সঠিক ভাবে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাই অর্জন করা যায় না। ফলে, এরা যখন বলে, 'বিপ্লবের তত্ত্বটা ঠিক হয়ে গেলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল', তখন এরা ভুলে যায় যে, সংস্কৃতিগত মান নিম্ন স্তরের হওয়ার ফলে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারও এদের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে না। মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ এবং দৈনন্দিন বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলোর কলাকৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এইসব তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি বারবার যে ভুল করে চলেছে. এটা তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ।

'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বই থেকে

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 47 Bengali Weekly July 12, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাজ্য জুড়ে এআইডিওয়াইও প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ এআইডিওয়াইও-র ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৩০ জুন মেছেদা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার হলে শতাধিক যুবকের উপস্থিতিতে 'যুব জীবনের সমস্যা সমাধানে সঠিক পথ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক মাইতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভার শেষে মোবাইল রিচার্জের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি এবং নিট ও নেটের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সমস্ত কর্মক্ষম যুবকদের চাকরির দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মোবাইল রিচার্জের দামবৃদ্ধির নির্দেশিকার প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

মেছেদা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের মৈপীঠ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে

মৈপীঠ

৩০ জুন আট দলের ওয়ান ডে ফুটবল টুর্নামেন্ট ও মহিলা ফুটবলারদের দুটি দলের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর ও বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি কমরেড অমল মিশ্র।

নদিয়া ঃ ২৬ জুন এআইডিওয়াইও-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ৩০ জুন প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পলাশী দক্ষিণপাড়ায়।

রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস, জেলা ইনচার্জ সেলিম মল্লিক। নিট, নেট দুর্নীতি সহ অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে যুব-আন্দোলন তীব্র করার সিদ্ধান্ত হয়। সভা পরিচালনা করেন কমরেড মলয় পাল।

পলাশী দক্ষিণপাড়ায় আলোচনাসভা

যুদ্ধবিরোধী নাগরিক সভা

প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সল্টলেক শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ এবং সিপিডিআরএস-এর যৌথ উদ্যোগে ৪ জুলাই করুণাময়ী মোড়ে নাগরিক সভা হয়।

বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ডঃ সামসুল আলম, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, মঞ্চের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কাঞ্চন দাশগুপ্ত, সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক।

সভায় সমস্ত বক্তাই অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে গণহত্যা বন্ধকরার দাবি তোলেন এবং বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে ভারতেও যুদ্ধবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি ও নানা অজুহাতে গ্রাহকদের টাকা কাটার প্রতিবাদে এবং পরিষেবা উন্নয়নে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগের দাবিতে ৬ জুলাই আগরতলায় বিদ্যুৎ দফতরে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (টেকা)-এর বিক্ষোভ

দলের দফতরে শ্রীলঙ্কার গণঅভ্যুত্থানের নেতা

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার ফ্রন্টলাইন সোসালিস্ট পার্টির নেতা, প্রখ্যাত আইনজীবী কমরেড নুওয়ান বোপাগে। শ্রীলঙ্কায় ২০২২-এর মে-জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজধানী কলম্বোয় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ দখল করে নিয়েছিল, কমরেড নুওয়ান ছিলেন সেই আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক।

কলকাতায় থাকাকালীন তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বমূলক রাজনৈতিক আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই অনুযায়ী ৪ জুলাই দলের কেন্দ্রীয় দফতরে তিনি উপস্থিত হন। আলোচনায় বসার আগে তাঁকে অভিনন্দন জানান এসইউসিআই(সি) -র কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত ও কমরেড দেবাশিস রায়। এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ রচিত কিছু পুস্তক কমরেড নুওয়ানের হাতে তুলে দেন কমরেড দাশগুপ্ত।

শ্রীলঙ্কার জনগণের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি, সেখানকার বাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে কমরেড নুওয়ান তাঁদের অবহিত করেন। আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্র ও মতবিনিময়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেও কমরেড নুওয়ানকে অভিনন্দিত করা হয়।

নিট কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী এনটিএ বাতিল, দোষীদের শাস্তি এবং রাজ্যভিত্তিক প্রবেশিকা চালুর দাবিতে ২৭ জুন ত্রিপুরার আগরতলায় বিক্ষোভ দেখান অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্যরা

স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা আইকার

একের পাতার পর

(২) খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার জন্য সেচের কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে, (৩) শিল্প, রেল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যুৎনির্ভর করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এই লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে কয়েকটি বেসরকারি মালিকের হাতে বিদ্যুৎ দফতর ছেড়ে দিচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইলেক্ট্রিসিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২২ তৈরি করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ এবং শিল্পের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে স্মার্ট মিটার চালুর তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের আগে তার দাম মিটিয়ে দিতে হবে। এই আইন এতদিনের চুক্তি বা অধিকারের উপর গুরুতর আঘাত। টিওডি সিস্টেম আরও আপত্তিজনক। এই ব্যবস্থায় দিনের কোন সময়ে গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে তার উপরে বিদ্যুতের দাম কত বাড়বে তা নির্ভর করবে। সন্ধ্যায় যখন সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের প্রয়োজন বেশি, সেই সময়ে তার দাম হবে সবচেয়ে বেশি। ফলে সাধারণ গৃহস্থের বিদ্যুতের দাম বাড়বে।

দেশে পর্যাপ্ত কয়লা থাকা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে বেশি দামে কয়লা আমদানির বিরোধিতা করা হয়েছে স্মারকলিপিতে। কারণ, এতে বিদ্যুতের দাম আরও বাড়বে। আইকা নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উদ্দেশে, এই জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন পাল্টানোর জন্য তীব্র গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com